না প্রেমিক না বিপ্লবী

নির্মলেন্দু গুণ

(কাব্যগ্রন্থ)
প্রথম প্রকাশিত- ১৯৭২

আগ্নেয়াস্ত্র

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক। সামরিক নির্দেশে ভীত মানুষের
শটগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ, যেন দরগার
স্বীকৃত মানৎ; টেবিলে ফুলের মতো মস্তানের হাত।
আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে,
অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
একটি আগ্নেয়াস্ত্র, আমি জমা দিই নি।

রবীন্দ্রনাথের বাঁশি

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা কবিতা লিখতো মধ্যরাতে, সেইসব চাষী,
সেইসব কারখানার শ্রমিক, যারা ইস্পাতের
আসল নির্মাতা, যারা তৈরি করতো স্নো-বিস্কিট,

আমার জন্য শার্ট, নীলিমার জন্য শাড়ি, তারা এখন
অন্য মানুষ, তাদের বাড়ি এখন প্রতিরোধের দুর্গ।
যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা ছাত্র ছিল পাঠশালার, বিশ্বের, সভ্যতার
কিংবা প্রকৃতির, সেইসব ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক
একত্রে মিলিত হয়ে ওরা এখন অন্যরকম;
ওরা এখন গান গায় না, ওরা এখন অন্য মানুষ।
কাঠের লাঙল যারা চেপে রাখতো মাটির ঔরসে,
সেইসব শিল্পী, সেইসব শ্রমিক,
যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা স্বপ্ন দেখতো রাতে–; ধলেশ্বরী নদী-তীরে
পিসীদের গ্রাম থেকে ওরা এখন শহরে আসছে।
কাঠের লাঙল ফেলে লোহার অস্ত্র নিয়েছে হাতে,
কপালে বেঁধেছে লালসালুর আকাশ,
শহর জয়ের উল্লাসে ওরা রবীন্দ্রনাথকে বলছে
স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথের গানকে বলছে স্টেনগান।
যারা গান গাইতো, বাঁশিতে আঙুল রেখে
যারা কবিতা লিখতো রাতে, সেইসব চাষী
আজ যুদ্ধের অভিজ্ঞ-কৃষক।
তোমার জন্য বন্দুকের নল আজ আমারো হাতের বাঁশি।

জীবনের প্রথম চুম্বন

আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে আজ রাতে ভালো করে দেখছি নিজেকে।
মাথার ওপর থেকে যে চুল ঊর্ধ্ববাহু,
ছাদ ভেঙে উঠে গেছে আকাশের দিকে তা থেকে পায়ের পাতা

পুরোনো স্যাণ্ডেলে মোড়া অবিকল আমি যা তা-ই,
হুবহু চোখের গর্ত, মাংস কম গালের দু'দিকে সতর্ক প্রহরারত
নেমে আসা গোঁফ অবিকল সেই আমি যেন আজো রয়েছি দাঁড়িয়ে
তোমার গন্তব্যপথে, আনন্দে, উল্লাসে কিংবা ব্যর্থ বিষণ্ণতায়।
দেখে দেখে আমি একা হয়েছি দু'জন, এ-পাশে আমার আমি
অন্যপাশে খুঁতখুঁতে তোমার দু'চোখ।
বড় কোলাহল চতুর্দিকে, অথচ আমি তো জানি কী গভীর
শূন্যতাবোধ তাড়া করে এনেছে আমাকে এই নির্ঘুম রাত্রির
দরোজায়, একটি নতুন চোখ আয়নার কাছাকাছি, মুখোমুখি।
আজ তো আমার দেহ সুশোভিত নয় কোনো নতুন পোশাকে,
ঠোঁটে নেই রক্তাক্ত চুম্বনের কোনো দাগ, চোখে নেই ব্যতিক্রম
স্বপ্ন কিংবা সম্ভাবনার অরুণ-উজ্জ্বল কোনো আভা, বুকে নেই
আলিঙ্গন ফেলে আসা কোনো রমণীর অশ্রুভেজা স্মৃতি।
তেমনি যেমন আমি প্রতিদিন শয্যা ছেড়ে
দরোজায় তালা দিয়ে চলে যাই উদ্দেশ্যবিহীন,
তেমনি তো আজও আমি পর্দার কাপড়ে বানানো
পুরোনো পাঞ্জাবি আর উষ্কখুষ্ক বেয়াদপ চুল
এনেছি মাথায় করে এই হোটেলের সুদৃশ কামরায়।
তবে কেন মনে হলো আমিও সুন্দর,
বড়ো বেশি অনেক সুন্দর?
তবে কেন মনে হলো আমার উদ্ধত নাক
যে কোনো নারীর বুকে সহজে বানাতে পারে
মহাসাগরের মতো রক্তময় একটি কবর, তবে কেন
মনে হলো আমার দু'চোখ থেকে উদ্গত হচ্ছে রশ্মি,
ভস্মীভূত হচ্ছে জনপদ, বিশ-শতকের সমস্ত সভ্যতা,
কবিতার অগ্রগতি, পিকাসোর সমস্ত ম্যুরাল পুড়ে-পুড়ে

জ্বলে যাচ্ছে, আগুন আগুন বলে দৌড়াচ্ছে মানুষগুলো
প্রাগৈতিহাসিক বন্য শ্বাপদসংকুল জনপদে?
তবে কেন মনে হলো আমার কর্ণযুগল বনভূমি
আলো করে হয়ে যাচ্ছে রেশমের কোমল খরগোশ,
বড়ো ক্লান্ত, সারাদিন খেলা করে সারারাত ঘুম যেতে চায়
যে-কোনো নারীর তৃষ্ণা, বুকের লজ্জায়।
আমি তো তেমনি আছি—বেমানান কণ্ঠদেশে অনাবশ্যক
তিলের বিস্তৃতি আর গুটানো আস্তিন থেকে
ভেসে-ওঠা স্ফীত শিরা-উপশিরা নিয়ে, এই মধ্যরাতে।
তবে কি রাত্রি গভীর বলে আমি আজ হয়েছি সুন্দর?
আমি তো মাতাল নই, তবে কেন অর্থহীন অযৌক্তিক
এই পক্ষপাত, এই ভালোবাসা, নিজেকে ঘিরেই জন্ম নেয়?
অর্থহীন অসুন্দর প্রতিটি মুখের আঁকে, শিরায় উপশিরায়,
স্নায়ুর তন্ত্রীতে শুধু ভালোবাসা, কী যে ভালো লাগছে আমাকে!
আমার দু'চোখে আজ বড় বেশি ভালোবাসা, বড় বেশি বেঁচে থাকা
যৌবনের, জীবনের আশা, আমি জানি একা একা ভালোবাসা
হয় না কখনো, আমি জানি ভালোবাসা আসে নি আমাতে।
আমি জানি এ শুধুই অভিমান, ভালোবেসে নিজেকেই হত্যা করা,
অভিনয়ে সাজানো বিনাশ।
আমি জানি, প্রতিদিন তিলে তিলে যৌবনের নামে যে সর্বনাশ
রমণীকে ভালোবেসে করেছি আমার, আত্মপ্রবঞ্চনা দিয়ে তার
কোনো স্মৃতি যাবে না ফেরানো। আমি জানি আমার বয়স হচ্ছে–
আমার বয়স হবে, যৌবন কাঁপবে শীতে, তুমি আসবে না।
তুমি আসতেও পারো, আসতেও পারে কোনো নারী, যেরকম
বহুদিন পরে আজকে হঠাৎ করে আমি ফিরে এসেছি আমাতে।
আজ তাই মনে হলো ভালোবাসা হবে, আমার চঞ্চুর চারপাশে,

আমার চক্ষুর চারপাশে অনেক উদ্ধত ঠোঁট, রমণীর ব্যগ্র বাহু
আলিঙ্গন লোভে তার বাড়িয়েছে দেহ,–স্নেহ আর ভালোবাসা
মুখর দর্পণ উঠেছে লাফিয়ে নগ্ন জীবনের প্রথম চুম্বনে।

সহবাস

কী দেখো অমন করে আমার ভিতরে?
আমি দেখি, আমি কি কেবলই দেখি? নীহারিকা,
শুধু পটে লিখা, তুমি কি কেবলই ছবি?
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে। আমি তাই
চোখে চোখে ভালোবাসা দেখি, ভাবি,
বাচাল ছেলের মতো বেয়াদপ পঙক্তিগুলো
কী ক'রে যে প্রতিদিন লজ্জাহীন নাচায় আমাকে।
তোমার শয়ন ঘরে সারারাত নাচি ধেই ধেই,
তুমি থাকো, আমি থাকি পাশাপাশি দুই ফ্ল্যাটে
কোনোই দেয়াল যেন নেই মাঝখানে।
চোখে চোখ থাকে, হাতের ভিতরে তার মাংসপিণ্ড
জ্বলে, কথা দিয়ে কথাকে জড়াই।
ক্ষীণ কটি আলো দেয় কৃষ্ণ-কররেখার আঁধারে,
তবু রোজ মন এসে বলে : ভালোবাসা বলে কিছু নাই।
মৃত্যু আর রমণীরা যেন ঠিক সমান বয়সী,
অভাব আর অক্ষমতা জীবনের সমান দোসর।
আমি যাকে ভালোবাসি, যাকে ভাবি সবচেয়ে
প্রিয়তম জন, সে আমার জন্মাবধি অভিন্ন মরণ।
কিছুই হয় না বলে লিখছি কবিতা, আত্মতুষ্টি ছাড়া
তাই এর মূল্য কোনোকিছু নাই। উপরন্তু তুমি রুদ্র,

তোমার ওখানে যেতে ভয় পাই, যেহেতু বন্যাকে
রোখে কবিতার যতিচিহ্ন নয়, প্রেমের আগুনে-পোড়া
কোমল মোমের সাদা ছাই। তবুও কবিতা লিখি,
কবিতার অন্তরালে তোমাকে জানাতে চাই এবং
বানাতে চাই একটি শব্দের মানুষ, অবিকল
আমার মতন করে মৃত্যুহীন তোমার ভিতরে।
সবচেয়ে কম দাবি নিয়ে যার সাথে নিত্য সহবাস,
সবচেয়ে কম কথা বলে যাকে খুব কাছে পাওয়া যায়,
সবচেয়ে কম ভালোবেসে যার কাছে অভিমান থাকে,
তাকেও বিরক্ত করি মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে তাকেও জাগাই
ডেকে অসময়ে মধ্যরাতে সাধুসঙ্গ থেকে। মুহূর্তেই
সে-মানুষ রক্তের শাড়ি পরে হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষিতা নারী,
পায়েতে ঘুঙুর বাঁধা, খোঁপায় অজস্র পাখি
বাঁকানো বাহুর বৃত্তে নৃত্য করে কাঁপায় আমাকে।
আমি তার মৃতদেহ সযত্নে টাকার মতো
বেদনার বাক্সে তুলে রাখি।
তারপর একটি মুহূর্ত আসে, যখন নিজের কাছে
আমি নিজে ধরা পড়ে যাই–; একটি সময় আসে
যখন সন্ধ্যা নামে, বিশ্বাসের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে
জনৈক আল্লার বান্দা উঠে যায় আকাশের দিকে–
সমুদ্রের শঙ্খ ডাকে অঘ্রানের শীতল বাতাসে।
আমি চোখের সমস্ত দৃষ্টি মেলে আকাশে ঈশ্বর খুঁজি,
ক্ষীণকণ্ঠে পাখি দেখে বলে উঠি :
‘এই ভগবান, আমাকেও পাখা দাও,
তোমাকে বিশ্বাস করি, বন্ধুরা নাস্তিক জানে,
সুতরাং বলো না তাদের, কিছু কিছু রূঢ়-সত্য

সংগোপনে সংরক্ষিত রবে আমাদের কোনো কোনো
জীবনের কাছে আজীবন।’
একজন জানতে চেয়েছে, ভগবান কি আছেন?
আমি ব্যঙ্গচ্ছলে তাকে খুশি করে বলেছি : ‘ব্রোথেলে।’
–তুমি জানতে চেয়েছো তোমাকে ভালোবেসে
এখনো আগের মতো দুঃখ পাই কিনা;
আমি হেসে হেসে কত সহজেই অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরে
বলেছি; ‘পাগল!’ প্রথমটির জন্যে ক্ষমা চেয়েছি রাত্রে,
দ্বিতীয়টি তোমার সান্নিধ্যলোভে তোমাকে ঠকানো,
মিথ্যে বলা, কেননা সত্য শুধু অপ্রকাশ্যে জ্বলে।
মৈথুন শেষ হয়ে গেলে যেমন নিজেকেও অপ্রিয়-
-দোষী-অপরাধী মনে হয়;-অবসাদ সারা দেহে
টানায় তাঁবুকে, ঠিক সেরকমই ক্লান্ত অবসাদ
আমার কপাল জুড়ে আজ রাত বসে আছে
লোভী মৎস্য-শিকারির মতো জলহীন অতল-পুকুরে।
মৎস্য কি শয়ন করে চোখ বুজে ঘুমায় কখনো?
আমি সেই অতল জলের সত্য জেনে নিতে গিয়ে
একটি অনামা ঝিলে আজ রাত মৎস্যদের
প্রধান অতিথি। চারপাশে রূপচাঁদা, শীতমাখা মাছ,
যেন জীবনের অপরূপ আনন্দের মেলায় এসেছি আমি,
এভিনিউ জানা নেই, সব স্ট্রীটে জলো অন্ধকার;
বাড়ির ঠিকানা চাই, কোন ব্লকে তুমি থাকো,
পাতালের কোন খাদে এমন সবুজ ঘাস জমে আছে।
পুষ্পিত লনে? কোনো কিছু জানা নেই,
বুঝি তাই এত পথ হেঁটে এসে ফিরে যেতে হবে
ব্যর্থতার মূর্ত কলরবে।

তোমাকে দেখার নামে তবুও তো দেখেছি অনেক,
জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে গিয়েছি চলে
সীমান্তের বলীরেখা ছিঁড়ে, যে ঘরে স্নানের শেষে
রমণী বদল করে অপবিত্র রাতের পোশাক
তার সে উলঙ্গ আভা, আঁশটেবিহীন দেহ
দেখেছি লুকিয়ে থেকে লেলিহান আগুন শিখায়।
তোমাকে দেখার নামে কুক্কুর আর কুক্কুরীর
অচ্ছেদ্য সঙ্গম দেখা হলো। মধ্যরাতে কলঘরে
জলের শব্দ শুনে প্রশ্ন জেগেছিল, এত শীতে
এত জল কার প্রয়োজন? তুমিও কি গতরাতে ছিলে
তার সাথে? তুমিও কি অবশেষে গর্ভে নিলে মানুষের
অমেয় সন্তান? তোমাকে দেখার নামে পুকুরে স্নানের শেষে
ঘরে ফেরা মায়ের গোপন মুখ ভেসে উঠেছিল।
এইসব স্মৃতি মনে এলে পাতায় পাতায় পড়ে
কবিতার বিন্দু শিশির। স্যাণ্ডেল আঁকড়ে-ধরা
পিচের শহর কথা বলে, ভোঁ ভোঁ করে ঘোরে,
গান গায়, রেডিওতে স্বরচিত কবিতা শোনায়,
কেউ কেউ কাঁদে, দুপুরে উইকেট পড়ে স্টেডিয়ামে,
বিকেলে সমস্ত সিটি জড়ো হয় চায়ের টেবিলে।
উঠতি চুলের মতো লতানো আঁধার নিয়ে রাত্রি নামে
বুড়ো নীলক্ষেতে। স্মৃতির খাদের ক্লেদে কী যেন
গিয়েছে ডুবে,–ভালোবাসা, মৃত্যু, প্রেম,
বরফের নিচের তিবেতে।

নিজস্ব প্রতিকৃতি

দাঁত মাজনের কয়লায় কালো চুল,

লম্বাটে মাথা, বামপাশে রবে সিঁথি,
কপালে সর্বনাশের চিহ্নরেখা;
কোটরে আগত চোখের অন্ধকারে
উদ্ধত নাক পলাতক খুনী একা।
রুখে দাড়িগুলো হবে ঘন ঝাউবীথি।
আড়াআড়ি করে হাত দুটো রবে বুকে,
কণ্ঠের হাড় চিকন বাঁশির মতো,
ডানহাতে কালো একটি একাকী তিল;
রক্তে রঙিন রোগের জীবাণু রবে,
দু'হাতেই ভাসা উপশিরাগুলো নীল—
বামহাতে গাঢ় লাল-বাসনার ক্ষত।
ভালোবাসা নেই, অভাবের, বেদনার
পা-দুটো কোমল মগ্ন মাটিতে রবে,
উল্টানো নখে শৈশব হবে বাঁধা।
শিশিরের মতো পরমায়ু যাবে খসে,
পাপ-পুণ্যের নদীতে তখনো রাধা
ভাসাবে প্রদীপ মৃত্যুর উৎসবে।
পিঠের বাঁকানো মাংস ধনুর মতো,
বুকের নিচেই কালো প্রহারের দাগ;
দীর্ঘ-দেহের রুগ্‌ণ অমিতাচারে
অতনু আমার অঙ্গের বিষে নাগ।

স্ত্রী

রান্নাঘর থেকে টেনে এনে স্তনগুচ্ছে চুমু খাও তাকে,
বাথরুমে ভেজানো দরোজা ঠেলে অনায়াসে ঢুকে যাও–

সে যেখানে নগ্ন দেহে স্নানার্থেই তৈরি হয়ে আছে
আলোকিত দুপুরের কাছে–, মনে রেখো,
তোমার রাত্রি নেই, অন্ধকার বলে কিছু নেই।
বিবাহিত মানুষের কিছু নেই একমাত্র যত্রতত্র স্ত্রীশয্যা ছাড়া।
তাতেই শয়ন করো, বাথরুমে, পুজোঘরে, পার্কে, হোটেলে,
সন্তানের পাশ থেকে টেনে এনে ঠোঁটগুচ্ছে চুমু খাও তাকে।
তার প্রতিটি উৎফুল্ল লগ্নে এক-একটি চুম্বন,
প্রতিটি রক্তিম মুখে এক-একটি নিঃশ্বাস দিতে হবে।
সভ্যতা ধ্বংস হোক, গুরুজন দাঁড়াক দুয়ারে,
শিশুরা কাঁদতে থাক, যমদূত ফিরে যাবে এবং অভাব
দেখো লজ্জা পেয়ে ম্লান হবে কিশোরীর মতো।
যেমন প্রত্যহ মানুষ ঘরের দরোজা খুলেই
দেখে নেয় সবকিছু ঠিক আছে কিনা, তেমনি প্রত্যহ
শাড়ির দরোজা খুলে স্ত্রীকেও উলঙ্গ করে
দেখে নিতে হয়, ভালো করে দেখে নিতে হয় :
–জঙ্ঘায়, নিতম্বে কিংবা সংরক্ষিত যোনির ভিতরে
অপরের কামনার কোনো কিছু চিহ্ন আছে কিনা।

রক্তলগ্ন সাপ

তুমি তো কিছুই নিলে না, অক্ষত যৌবন, প্রেম, দ্বিধাগ্রস্ত
আমার পৃথিবী; সুজলা-সুফলা বাংলা, প্রিয় জন্মভূমি;
শ্যামরক্তে পোষা নীলপাখি, তুমি তো কিছুই নিলে না।
শেষ রাত্রির ট্রেন ফেল করা করুণ যাত্রীর মতো আমি
জলের সৌরভ নিয়ে ফিরেছি একাকী।
বিবাহবাসর থেকে বর তার যাত্রীসহ উঠে গেলে

অপূর্ণ বধূর মতো মেখেছি সমস্ত দেহে
চন্দনের পবিত্র অপমান। তুমি তবু কিছুই নিলে না,
অক্ষয় যৌবন, প্রেম, বসন্তের শ্রীমন্ত শয়ান।
বুঝি তুমি প্রেম নও, নও প্রেমিকাও, তবু এক প্রেমিকার
মতন বিশ্বাস আমাকে দিয়েছে যে সে আমার প্রেমের গৌরব,
ভালোবাসা, আমরণ রক্তলগ্ন সাপ।
তাকে, তার পাদপদ্মে সমর্পিত আমার সমস্ত সৈন্য,
তীরন্দাজ, কবিতা-কাঞ্চন, তুমি তবু কিছুই নিলে না;
নগর বিধ্বস্ত করে ফিরে গেলে ভূমিকম্প, টর্নেডোর হাওয়া।
আমন ধানের মতো জল ভেঙে মাথা তুলে দাঁড়ালে বিষাদ
আজন্ম অন্ধের মতো তোমার আশ্রয় চাই, প্রিয়তমা।
বিষাদে বিষাক্ত দেহ তুলে নেবে তুমি, জেলেরা যেমন করে
ত্রস্ত হাতে জাল থেকে মৎস্য তুলে নেয়– অথবা,
বেদেনী যেমন সব খেলা শেষ হলে বাক্সে ভরে
দন্তহীন ক্রীড়াক্লান্ত বিষাক্ত গোক্ষুর।

পূর্ণিমার মধ্যে মৃত্যু

একদিন চাঁদ উঠবে না, সকাল দুপুরগুলো
মৃতচিহ্নে স্থির হয়ে রবে।
একদিন অন্ধকার সারাবেলা প্রিয় বন্ধু হবে,
একদিন সারাদিন সূর্য উঠবে না।
একদিন চুল কাটাতে যাবো না সেলুনে
একদিন নিদ্রাহীন চোখে পড়বে ধুলো।
একদিন কালো চুলগুলো খসে যাবে, একদিন
কিছুতেই গন্ধরাজ ফুল ফুটবে না।

একদিন জনসংখ্যা কম হবে এ শহরে,
ট্রেনের টিকিট কেটে
একটি মানুষ কাশবনে, গ্রামে ফিরবে না,
একদিন পরাজিত হবো।
একদিন কোথাও যাবো না, শূন্যস্থানে তুমি
কিংবা অন্য কেউ বসে থেকে বাড়াবে বয়স;
একদিন তোমাকে শাসন করা অসম্ভব ভেবে
পূর্ণিমার রাত্রে মরে যাবো।
একদিন সারাদিন কোথাও যাবো না।

চোখের ভিতর, নখের ভিতর

কে জানে কোন্ চোখের ভিতর লুকিয়ে আছো,
চোখের ভিতর, নখের ভিতর লুকিয়ে আছো।
সূর্য লেগে ফুলের মতো
লুকিয়ে আছো, শুকিয়ে গেছো
সারাটা দিন ওতপ্রোত
লুকিয়ে আছো সারাটা রাত বুকের ভিতর।
ভীষণ কালো,– 'ইস্ কী ঘন' চুলের ভিড়ে;
হৃদয় খুলে কণ্ঠমূলে যে গান জাগে,
যে গানগুলি কান্না হয়ে
নদীর মতো যাচ্ছে বয়ে শরীরময়—
লুকিয়ে আছে সেসব গানে, সেই নদীতে;
লুকিয়ে আছো দুখের মতো, রোগের মতো
সংগোপনে সেই বোধিতে।
লুকিয়ে থাকো সারাটা দিন, প্রিয়তমা,

সারাজীবন এমনি করেই লুকিয়ে থেকো।

ফুলদানি

যেকোনো বাগান থেকে যেটা ইচ্ছে সেই ফুল,
যেকোনো সময় আমি তুলে নিয়ে যদি কভু
তোমার খোঁপায়, আহা, অজগর তোমার খোঁপায়
সাজাবার সুযোগ পেতাম–; তাহলে দেখতে লীলা,
তোমার শরীর ছুঁয়ে লাবণ্যের লোভন ফুলেরা
উদ্বেল হৃদয়ে নিত্য বিপর্যস্ত হতো, মত্ত মমতায়
বলতো আশ্চর্য হয়ে, হতো বলতেই :
‘খোঁপার মতন কোনো ফুলদানি নেই।’

পরমায়ু

চতুর্দিকে তৈরি হচ্ছে পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর,
পথ মোড়ে শহীদ মিনার, গোলপার্ক,
প্রেমের কবিতা। চতুর্দিকে জীবনের গান।
বেঁচে থেকে সুখ-দুঃখ, দালানের ওপাশে দালান।
যেন আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো,
যেন বা মানুষ ভালোবেসে চিরকাল
লীলার চোখের মতো বেঁচে থাকবে।

প্রথম অতিথি

এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখো নি তুমি।

মুহূর্তে সবুজ ঘাস পুড়ে যায়,
ত্রাসের আগুন লেগে লাল হয়ে জ্বলে ওঠে চাঁদ।
নরোম নদীর চর হা-করা কবর হয়ে
গ্রাস করে পরম শত্রুকে;
মিত্রকে জয়ের চিহ্ন, পদতলে প্রেম,
ললাটে ধুলোর টিপ এঁকে দেয় মায়ের মতন;
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখো নি তুমি।
নদীর জলের সঙ্গে মানুষের রক্ত মিশে আছে,
হিজল গাছের ছায়া বিপ্লবের সমান বয়সী।
রূপসী নারীর চুল ফুল নয়, গুচ্ছ গুচ্ছ শোকের প্রতীক,
বাংলাদেশ আজ যেন বাংলাদেশ নয়;
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখো নি তুমি।
কখনো দেখে নি কেউ।
বাতাস বাতাস শুধু নয়,
ত্রিশ লক্ষ মানুষের দীর্ঘশ্বাসময়
আকাশ আকাশ শুধু নয়,
এরকম বাংলাদেশ বাংলাদেশ নয়।
এখানে প্রাণের মূল্যে
নদীর জলের মধ্যে আসে বান,
টর্নেডো-টাইফুন-ঝড়,
কাল-বৈশাখীর দুরন্ত তুফান।
কোকিল কোকিল শুধু নয়, পাখি শুধু পাখি নয় গাছে,
বাউলের একতারা উরুর অস্থির মতো
যেন আগ্নেয়াস্ত্রে বারুদের মজ্জা মিশে আছে।
আজকাল গান শুধু গান নয়, সব গান অভিমান,
প্রাণের চিৎকার বলে ক্রুদ্ধ মনে হয়।

এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখে নি কেউ,
তুমি তার প্রথম অতিথি।

রোদ উঠলেই সোনা

এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে,
সবাই মিলে ভিজতে পারি।
অনেক কিছুই অরক্ষিত
অনেক কিছুই খোলা,
যেমন আকাশ, ভোরের বাতাস,
রক্তমাখা ধুলা।
তোমরা যারা অনেক দূরে
মগরা থেকে পাহাড়পুরে
রক্ত ঢেলে হাড় বিছিয়ে
অরক্ষিত পথ বেঁধেছো
স্বাধীনতার,
হৃদয় জুড়ে তাদের আসন
বৃষ্টি কিংবা রোদের শাসন
সব কিছুকেই এড়িয়ে যাবে।
বৃষ্টি লেগে আগুন হবে
রোদ লাগলেই সোনা।
তোমরা যারা হারিয়ে গেছো
তাদের হাড়ে বোনা;
বাংলাদেশে বৃষ্টি হবে,
রোদ উঠলেই সোনা।

কাঠের কপাট

এখন ঝড়ের দিন, চেয়ে দেখো ধুলোঝড়ে
আকাশ তুলোর মতো উড়ে গেছে।
উড়ে গেছে খোলা চুল, কালো চোখ,
বেণীতে বাঁধানো সন্ধ্যা, যেন আঙিনায়
টানানো কাপড় ছিল কারো।
এখন ঝড়ের দিন, বৃষ্টি হচ্ছে,
বাতাসে উড়ছে শহর,
কোমর-বাঁকানো পথ, নীলক্ষেত
কলেরা রোগীর মতো বমি করছে পথে।
চেয়ে দেখো সভ্যতার ভয়াল বালক
মাতাল লাটাই হাতে কালো স্ট্রীটে
কী রকম শোকে মুহ্যমান।
শিকড়-উল্টানো গাছ ভেংচি কাটছে দাঁতে,
চেয়ে দেখো রমনার আদিগন্ত মাঠ
এখন সবুজ নয় সেরকম, যত আমি বন্ধ করি
বেদনার কাঠের কপাট; ততবার আসো তুমি।
কল্পনা উড়ায় ধুলো, চুলগুলো হাত রাখে হাতে;
যেন তুমি ঝড়ে মিশে আছো, তোমাকে পাবার জন্য
রাজ্যজুড়ে ঝড়ের উৎসব।
বৃষ্টি হচ্ছে, এখন ঝড়ের দিন,
পথের উড়ন্ত ধুলো আমাকে পাগল করে
আমারই চতুর্দিকে উড়ছে হাওয়ায়...।

কুশল সংবাদ

আবার স্বাভাবিক হবে সবকিছু :
রাজপথ, ন্যুমার্কেট, বিশ্ববিদ্যালয়,
সিনেমা হলের সামনে ভিড় হবে,
কাউন্টারে খিলখিল হাসি।
আমরা উত্তপ্ত হবো পরস্পর হাসি-তামাসায়।
কেবল পেছন থেকে হঠাৎ ডাকবে তুমি,
নিহত আত্মার স্মৃতি শুধাবে কুশল :
'তোমরা কেমন আছো রক্তাক্ত বাংলায়?'

গ্রীষ্মকালীন ছুটি

যেন পৃথিবীটা থেমে আছে দমহীন ঘড়ির কাঁটার মতো
স্থিরচিত্র। কলাভবনের বিস্তৃত শূন্যতা জুড়ে স্মৃতিপদচিহ্ন শুধু।
সর্বত্র স্মৃতির মতো খা খা করিডোরে, ঘাসে, ইটে,
কংক্রিটের শুয়ে-থাকা পিঠে পা ফেলে আমি একা হাঁটছি এখনো।
মনে হয় সব কিছু অনন্ত সময়, শেষবার দেখে নিচ্ছি,
চলচ্চিত্রের সর্বশেষ প্রদর্শনী হচ্ছে এখন।
যেন এই প্রেক্ষাগৃহে আর কোনোদিন
একদা মুখর করে রাখা মানুষেরা ফিরবে না।
যেন সব প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে
সিনেমা সেটের মতো পরিত্যক্ত নকল এলাকা
অকস্মাৎ গ্রীষ্ম এসে দিয়েছে জ্বালিয়ে।
আমি একা, প্রজ্বলন্ত অগ্নির ভিতরে বসে আছি,
ভীষণ চিৎকার করে ডাকছি তোমাকে।

–প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, তুমি নেই,
কী সুন্দর কোলাহল ছিল, কোলাহল নেই,
আমার বিকৃত ছায়া শুধু অপমান করছে আমাকে।
আমি তবে কার কাঁধে ছায়া রেখে হাটছি এখনো?
তোমাকে পাহারা দিচ্ছি, চোখে চোখে রাখছি দালান;
কে জানে কখন তুমি নির্জন অভিমানে অনন্ত খাদের মধ্যে
ডুবে যাবে, অতল আঁধার থেকে আর উঠবে না,
ভবিষ্যৎ পাবে না তোমাকে।

কথাবলাকলাকৌশল

নির্দিষ্ট নিবাস নেই, উদ্বাস্তু-উন্মুল ভিখিরির মতো ঘরহীন;
সারাদিন ঘুরেঘুরে শহরের এদিকে-ওদিকে
সন্ধ্যা হলে সব কথা রমনার বুকের ভিতরে জমা হয়।
আমি বুঝি কর্ণকুহরে কারা শব্দিত-সঘন-পদপাতে
কথা বলে, কথাবলাকলাকৌশলের মালা গাঁথে বসে বসে।
মনে হয় অস্থিরতাময় এই কথাগুলো যেন রেসকোর্সে
মুজিবের সভা-; শরীরে শরীর লাগা লাখো লাখো
স্বনিষ্ঠ সংলাপ, পরদিন তোমাকে বলার জন্য যা শুধুই
তৈরি হচ্ছে উত্তেজিত কামে-ক্লেদে, মাংসের বিভিন্ন কোঠায়।
এখন তো সবেমাত্র অন্ধকারে নেমেছে শহর, আরো বহু
বিনিদ্র প্রহর জেগে থেকে বিভিন্ন দিনের চিত্র চোখে গেঁথে নিয়ে
আমাকে জাগতে হবে এই জনশূন্য রাত একা একা;
জেগে থাকতে হবে এই একাগ্র শব্দের বিছানায়।
কিডনিতে মাথা রেখে যারা ছিল কল্পনার অপারগ শিশু
ক্রমশ মাথার দিকে অগ্রসর হবে তারা, তোমার বুকের মতো

এ আকাশ ফর্সা হবে দ্রুত, কার্ডিগানে শীতের সকাল নিয়ে
তুমি এসে দাঁড়াবে রোদ্দুরে, ডেকে নেবে অন্তরালে,
এলোমেলো হবে শব্দ। তোমার চুলের বেণী বেয়ে বাথরুমে
জলের ধারার মতো নিরুপায় কণ্ঠ থেকে শব্দের ডাকাত
অপচয় স্মৃতি হয়ে এক-একটি সকাল ব্যর্থ দিনের মতো
নেমে যাবে ক্লেদে, ফুটপাতে, করিডোরে, মধ্যাহ্নের রোদে।
কোনো কথা জমবে না, কলাভবনের বিস্তৃত শূন্যতা জুড়ে
সকল বিভাগ পুনর্বার হবে একা। আমি শুধু কথাবলাকলাকৌশলের
মালা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে জ্বলবো একা; তুমি বলবে : 'যাই'।

দাঙ্গা

খাসীর সিনার মতো টুকরো-টুকরো কেটে ফেলবো তোকে,
এক কোপে ধড় থেকে নামাবো মাথাকে।
বিকেলে ফুলের দাম ইদানীং বেড়েছে অনেক,
ইদানীং লক্ষ্য করছি কণ্ঠে তোর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
ওঠে গান, গ্রীবায় গর্বিত হয় এলোমেলো মেদমত্ত ভাঁজ।
তোর অযৌক্তিক স্তনগুচ্ছ কঁপায় আমাকে,
কী দারুণ অহংকারে নিতম্ব কার্পাসে নাচে তোর।
আমি তোকে খাসীর সিনার মতো টুকরো টুকরো করে
কেটে ফেলবো আজ।
অতঃপর জবেহ-করা মোরগের মতো অন্তিম নৃত্যের শেষে
তোর শান্ত সমাহিত অসামান্য রূপসী শরীর
শব্দহীন পড়ে থাকবে পথে।
একটি পিঁপড়ে এসে অনায়াসে কালো তিলে বসবে কটিতে,
আর উড়ন্ত স্তনের চিহ্নে বসবে দুপুর।

আমার বাড়ির পাশে সারারাত পড়ে থাকবি তুই।
দু'হাত বিচ্ছিন্ন তোর মৃতদেহ আচার্যের প্রতিমার মতো,
নাভীর সামান্য নিচে কালো চাঁদ, ক্ষতচিহ্ন পিঠে নিয়ে
আজীবন পড়ে থাকবি তুই।

বিশ্বাসের আগুন

অন্ধকারে ভয় করি না, যারা নক্ষত্রের
শাড়িতে আগুন জ্বেলে ঘরে ফিরছে–
তারাই দেখাবে পথ।
পাথরে পাথর ঘষে যদি আগুন না জ্বলে,
আমরা আঁধারে আঁধার ঘষে
ব্যতিক্রম আগুন জ্বালাবো।
একটি পাথর তুলে আঁধারের আরেকটি
পাথরে ছুঁড়ে মারবো প্রেম।
ভালোবাসা আলো জ্বলবে,
জ্বিরের জ্বালার মতো জ্বলজ্বলে
আকাশে আগুন। অন্ধকারে ভয় করি না,
আমরা আঁধারের গাল ছুঁয়ে
নেমে আসবো দল বেঁধে।
সংরক্ত বিশ্বাস এসে ডেকে নেবে
হারানো স্বপ্নের কাছাকাছি।
মাটির প্রদীপ জ্বেলে, মা আমার,
আমি আসিয়াছি, অন্ধকারে,
মধ্যরাতে নক্ষত্রের লাল-পাড়ে
বিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে।
তোমার হাতের শাঁখা জ্বলে উঠবে

স্নেহে, তোমার ছেলে ঘরে ফিরবে,
জায়নামাজের মধ্যে তার স্পষ্ট
পদচিহ্ন, মোমের শিখার টানে
অন্তর্গত সুতোর মতন তোমার প্রার্থনা
উদ্ভাসিত হবে ক্রমে ক্রমে।
তোমার হাতের তসবিহর মতো
মৃত লক্ষ-ছেলের মাথার খুলি
আজ কী সুন্দর আলো দিচ্ছে দেখো।
মাগো, অন্ধকারে ভয় করো না,
আমরা ফুসফুসে আগুন জ্বেলে
তোমার জন্য ঘরে ফিরছি;
পাথরে পাথর ঘষে
পাথরে হৃদয় ঘষে
হৃদয়ে হৃদয়।

মুখোমুখি

তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।
জীবনের নশ্বর শরীর ছুঁয়ে যে বালক
একদিন উত্তাল নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছিল,
সাপের ফণায় তার কচি হাত রেখে যে বালক
বলেছিল মনসাকে মানি না কখনো;
তাড়াতে তাড়াতে সাপ কতদূর নেবে তাকে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।
রৌদ্র যার বন্ধু ছিল, বৃষ্টি যার গোপন-প্রেমিকা,

অগ্নি যার বুকের উদ্ভাস, বাংলার মাটি ছুঁয়ে
সে এখন প্রতিবাদী মুখোমুখি দুরন্ত যুবক।
তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে তাকে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।
আশৈশব স্বাধীনতা লোভে যে যুবক
হিংসাহীন প্রেমের বিক্ষোভে বলেছিল :
‘যুদ্ধ নয়, ভালোবেসে জিতে নেবো তারে’
মানুষের মৃত হাড়ে সে এখন সশস্ত্র সন্ত্রাস।
তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে তাকে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।

যে এলাকা আমার দখলে

হাত বদল হচ্ছে বহু কিছু। হাত বদল হচ্ছে অনেকেই।
একটি প্রিয় বইয়ের মতো আজ এ হাতে কাল ও হাতে,
বদল হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র সিলেট থেকে চুয়াডাঙায়।
যেমন তুমি স্নানের শেষে বদলে ফেলো হঠাৎ-ভেজা
রাতের শাড়ি, তেমনি এখন বদল হচ্ছে খুনির পোশাক,
রক্তমাখা শহরগুলো পাকিস্তানে, বাংলাদেশে।
আমার ঘরে কিছুই হয় নি, একেবারে কিচ্ছু হয় নি,
তেমনি আজো চুল-ওড়ানো, ফুল-কুড়ানো বাতাস খেলে।
আমি আমার ঘরের চালে লাল পতাকা উড়িয়ে রাখি।
অন্ধকারেও আমার ঘরে তিনটি তারা, সবার জন্যে বন্ধ দুয়ার,
তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিই না।

সল্টলেকের ইন্দিরা

শত্রুর তাড়া খেয়ে আমরা যাবো না আর
সীমান্তের দেয়াল ডিঙিয়ে কোনোদিন।
ছিন্নমূল, পাখির মতন নিঃস্ব
মানুষের ঝাঁক, সল্টলেকে, কল্যাণীতে,
মেঘালয়ে, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত প্রদেশে
আর কোনোদিন উন্মুখর তোমার প্রতীক্ষায়
আমাদের সময় যাবে না অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
চোখের সমুখে।
সমস্যাসংকুল এই শতাব্দীর
এক কোটি মানুষের ভিড়ে
ফিরে ফিরে তুমিও যাবে না আর
কোনোদিন ক্ষমাপ্রার্থী মানবতা হতে।
নিজ হাতে আকাশের তারার আলোকে
বেঁধে দিয়ে ঘর, ভালোবাসা, চাল-ডাল,
উদ্যম প্রহর নিয়ে তুমি আর ফিরবে না
মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে।
এখন শূন্য সব, তিন শ' দিনের ঘর,
হা-করা দুয়ার, মেঘালয়,
সল্টলেক, কল্যাণীর সশস্ত্র-শিবির,
কিংবা আগরতলার খোলা মাঠ।
কে যেন স্বপ্নের মতো চুপি চুপি এসে
শূন্য কপাট দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে সবকিছু।
একদিন নিজ হাতে বেঁধে দিয়েছিলে ঘর,
মনোহর ভালোবাসা, স্বাধীনতা দিয়ে।

এখন শান্ত সব, সল্টলেক একাকী ঘুমিয়ে আছে।
যেন পরিত্যক্ত দেশপ্রেমিকের খালি বাড়ি;
রাজাকার, আল-বদরের ভয়ে ভীত,
মৃত, ম্রিয়মাণ।
তোমার নোয়ানো মাথা সল্টলেকে,
শরণার্থীর ঘরে ঘরে বৃষ্টির অন্ধকারে
অক্ষয় আগুন হয়ে একদিন জ্বলে উঠেছিল।
আজ সে উদ্ধত মাথা বরাভয়ে
সবচেয়ে বড় সেই আকাশের
দর্পকেই স্পর্শ করেছে।
সল্টলেকের ভাঙা-ঘর,
মাদুর, চাঁদের কথা, ভালোবাসা, স্মৃতি;
এখন বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে।
সীমান্তের চিহ্ন ভেঙে ঢুকে গেছে পৃথিবীর
অসীম হাওয়ায়...।

তুলনামূলক হাত

তুমি যেখানেই স্পর্শ রাখো সেখানেই আমার শরীর।
তোমার চুলের ধোয়া জল তুমি যেখানেই
খোঁপা ভেঙে বিলাও মাটিকে;
আমি এসে পাতি হাত, জলভারে নতদেহ আর
চোখের সামগ্রী নিয়ে ফিরি ঘরে, অথবা ফিরি না ঘরে,
তোমার চতুর্দিকে শূন্যতাকে ভরে থেকে যাই।
তুমি যেখানেই হাত রাখো, যেখানেই কান থেকে
খুলে রাখো দুল, কণ্ঠ থেকে খুলে রাখো হার,

সেখানেই শরীর আমার হয়ে ওঠে রক্তজবা ফুল।
তুমি যেখানেই ঠোঁট রাখো সেখানেই আমার চুম্বন
তোমার শরীর থেকে প্রবল অযত্নে ঝরে যায়।
আমি পোকা হয়ে পিচুটির মতো
তোমার ঐ চোখের ছায়ায় প্রতিদিন খেলা করে যাই,
ভালোবেসে নিজেকে কাঁদাই।
তুমি শাড়ির আঁচল দিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিলে
আমি রথ রেখে পথে এসে তোমারই দ্বৈরথে বসে থাকি
তোমার আশায়। তুমি যেখানেই হাত রাখো
আমার উদগ্রীব চিত্র থাকে সেখানেই। আমি যেখানেই
হাত পাতি সেখানেই অসীম শূন্যতা, তুমি নেই।

ইথারে নির্মিত পিয়ন

অদৃশ্য ইথার দিয়ে আমি একটি পিয়ন বানিয়েছি,
আমার কণ্ঠস্বর ব্যাগে করে অলৌকিক সে পিয়ন
আকাশের মতো নীল খাম নিয়ে যায় তোমার ওখানে।
প্রতিদিন কী সুন্দর হালকা বাতাসে উড়ে কণ্ঠস্বর
তোমার ওখানে যায়, কথা বলে কুশল শুধায়।
অলৌকিক এ পিয়ন আমাকে নকল করে
অবিকল আমার মতন হয়ে কথা বলে।
হয়তো বিষ্টি হচ্ছে, আকাশে অস্থির মেঘ,
সোনালি-ঝর্ণার মতো আমার পিয়ন তবু
বিষ্টিতে ভিজে ভিজে তোমার ওখানে যাবে, দরোজায়
টোকা দিয়ে দুপুরের ঘুম থেকে তোমাকে জাগাবে।
অদৃশ্য ইথার দিয়ে আমি একটি পিয়ন বানিয়েছি,

আমার সমস্ত চিঠি বিলি করে সে পিয়ন ফিরছে হাওয়ায়।

শহীদ

তুমি এখন শুয়ে আছো মুষ্টিবদ্ধ দু'হাতে ঘুম।
পথের মধ্যে উবু হয়ে তুমি এখন স্বপ্নরত,
মধ্যরাতে আকাশভরা তারার মেলায় স্বপ্নবিভোর,
বুকে তোমার এফোঁড়-ওফোঁড় অনেক ছিদ্র,
স্বাধীনতার অনেক আলোর আসা যাওয়া।
তুমি এখন শুয়ে আছো ঘাসের মধ্যে টকটকে ফুল।
পৃথিবীকে বালিশ ভেবে বাংলাদেশের সবটা মাটি
আঁকড়ে আছো, তোমার বিশাল বুকের নিচে এতটুকু
কাঁপছে না আর, এক বছরের শিশুর মতো থমকে আছে।
তোমার বুকে দুটো সূর্য, চোখের মধ্যে অনেক নদী,
চুলের মধ্যে আগুনরঙা শীত সকালের হু হু বাতাস।
মাটির মধ্যে মাথা রেখে তুমি এখন শুয়ে আছো,
তোমাকে আর শহীদ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

অবরুদ্ধ বর্বরতা

কোন দিকে যাবে? উত্তরে পদ্মার জল,
উত্তাল তরঙ্গমালা 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ' বলে
ফেরাবে তোমাকে। দক্ষিণে সাগর ভরা 'বিক্রান্ত'র
অসীম বিক্রম। সমস্ত নদীর মাছ প্রতিরোধে
হয়েছে জাহাজ....পালাবার পথ নেই জলে।
মাথার ওপর আকাশ অথবা পায়ের নিচের মাটি
কোনোটাই তোমার নয়, কেউ তোমাকে আশ্রয়

দেবে না; তোমাদের অপকীর্তির কবর থেকে
তোমরা আর উঠে আসতে পারবে না।
যারা স্বদেশের মাটির গভীরে ডুবে ছিল এতদিন,
অথবা তোমরাই যাদের পুঁতে রেখেছিলে;
তাদের কংকাল অধঃপতনের পাতালে
টানছে তোমাদের। টেনে নেবেই।
তুমি তো সেনিক নও, তুমি বর্বরতা, তুমি
যতই পোশাক খোলো তোমাকে সহজেই চেনা যায়।
তোমরা পালাতে পারবে না। মাথার ওপর থেকে
ভগবান তোমাদের কাঁধে মৃত্যু ছড়াচ্ছেন,
যে মৃত্যু কেবল বর্বরতাকেই স্পর্শ করে, হত্যা করে।
কোন্ দিকে যাবে? কোথায় পালাবে তুমি?
পূর্বে নিশ্চিত সূর্য, পশ্চিমে শত্রুর সীমান্তে অবরোধ,
বাংলাদেশে বর্বরতার নিশ্চিত কবর।

কাপুরুষের স্মৃতিচারণ

মৃত্যুঞ্জয়ী নই জানি, তবু মৃত্যুভয় মনে হয়
হাতের আঙুল কিংবা বাউলের চুল হয়ে
ঝুলে আছে সংলগ্ন বাহুর মতো কাঁধের দু'পাশে।
যখন রাত্রি হয়, অন্ধকারে চক্ষু মুদে আসে
অথবা আলোয় ভরা ঠোঁট-ফাটা শীতের বাতাসে
সূর্য ঢাকা থাকে কুয়াশার পশমী চাদরে,
আমি ভয় পাই প্রকৃতিকে,
হয়তো আকাশই শেষে আল-বদরের মতো
ঝোপ থেকে অকস্মাৎ কোপ দেবে ঘাড়ে।

আমি ভয় পাই, আকাশের তারাগুলো অন্ধকারে জ্বলে,
যেন আমাকেই কেন্দ্র করে পাকসেনাদের সিদ্ধান্তের
সভা হচ্ছে আকাশের গোপন গুহার কালো মাঠে।
আমি ভয় পাই, জানি আমি মৃত্যুঞ্জয়ী নই,
তাই ভীত হই বন্ধুর উত্যক্ত ব্যবহারে।
হয়তো কিছুই হবে না,
তবু যদি অপঘাতে মৃত্যু লেখা থাকে,
যদি কেউ শত্রু ভেবে আমার বুকের মধ্যে
সন্ত্রস্ত আত্মার চোখে মৃত্যু-নকশা আঁকে!
এই ভয় আজীবন, আশৈশব কাপুরুষ করে
রেখেছে আমাকে।
আমি কাপুরুষ, মৃত্যু-ভয়ে ভীত,
প্রতিবাদে সন্দিগ্ধ, সংযত হয়ে কথা বলি।
এমন কি যখন মিছিলে যাই আমি থাকি মাঝখানে,
অনেক লোকের ভিড়ে নিরাপদে নিজেকে সাজাই।
সতর্ক দু'চোখ থাকে আশেপাশে
কে জানে কখন আসে ঘাসে ঢাকা শিরস্ত্রাণ,
মৃত্যুর মুখোশপরা সৈনিকের দল।
এইসব প্রাত্যহিক ভয়ে মোটামুটি কেটে গেছে
কেটে যাচ্ছে না প্রেমিক না বিপ্লবী পঁচিশ বছর,
কেটে যাবে আরো কিছুদিন।

যুদ্ধের বিভ্রান্ত বন্দী

আমি এখন কোথায় যাবো? দুটো মানুষ
দুদিক থেকে ডাকছে যেন যমের মতো;

‘এদিকে এসো,
এদিকে শোনো।’
আমি যেন পথ-হারানো আঁধার রাতে
একটি পাখি,
অথবা কোনো
ঘরের মধ্যে আটকে রাখা যুদ্ধবন্দী। দুটো মানুষ
দুদিক থেকে অষ্টপ্রহর আমায় ডাকে :
‘এদিকে এসো,
এদিকে শোনো।’
আমি এখন কোথায় যাবো? প্রেমের দিকে
তোমার মানা, আন্দোলনে সত্য-আগুন।
একটি মানুষ
দু’দিকে যাবে?

নিক্সনের জাহাজ

ব্রজেন দাশের মতো দ্রুতগতি এক-একটি জাহাজ
হিংস্র তিমির মতো ধেয়ে আসছে সমুদ্রের জলে,
ট্রিসিয়া, তোমার জাহাজগুলোকে ফেরাও।
তুমি জানো না কী ভয়ঙ্কর এ জাহাজগুলো
আমার বুকের মধ্যে সরাসরি ঢুকে যেতে পারে,
যেখানে তোমার মতো সোনালি চুলের শস্য
বাংলার আকাশ ভরা শুভ্র-মেঘমালা।
ট্রিসিয়া, তোমার জাহাজগুলোকে ফেরাও।
আমাকে হত্যার জন্য কী দারুণ ষড়যন্ত্র,
কী ঘৃণ্য আয়োজন আমেরিকার গোপন বন্দরে,

একে একে পাঁচটি জাহাজ এসে গর্ভে তুলে
নিয়েছে সন্তান। ব্রজেন দাশের মতো দ্রুতগতি
এক-একটি জাহাজ ব্রজেনের হত্যাকারী হতে
হিংস্র তিমির মতো ধেয়ে আসছে সমুদ্রের জলে।
আমার বুকের মধ্যে তার উদ্ধত মৃত্যুর ছায়া,
আমার হৃদয়ের মধ্যে তার অবদমনের সদাজাগ্রত
ভীতিমূল, আমার জন্মভূমি হা-করা হাঙরের মুখে
তোমার চুলের মতো বারবার কেঁপে উঠছে।
ট্রিসিয়া, তোমার জাহাজগুলোকে
রেশমের চুলে বাঁধো।

কালো চশমায় তুমি

কাউকে কাউকে চশমায় খুব সুন্দর মানায়,
কাউকে কাউকে অসম্ভব বেমানান ঠেকে।
কাউকে কাউকে চশমায় দারুণ সুন্দর মনে হয়,
মনে হয়, এই সেই চশমার জন্য মুখ।
কাউকে কাউকে বেমানান ঠেকে,
ইচ্ছে করে তুমুল ঘুষিতে সমূলে উঠিয়ে দিই
কালো ফ্রেম, সাদা কাচ, কপালের স্বৈরাচারী টিলা।
তোমাকে সুন্দর লাগে, চুমু খেতে ইচ্ছে করে চোখে,
ইচ্ছে হয় ডেকে বলি : ‘সাবাস ঊর্মিলা, তোমাকেই
মানায় এসবে। পুরু গ্লাসে, মোটা ফ্রেমে,
ইলিশের মতো বাঁকা চশমায় তোমাকে মানায়।’
চোখ থেকে গ্লাস খুলে নিয়ে ঘুম ভাঙা চোখে
যখন বলতে তুমি, আমি বড়ো কুয়াশার মতো

কথা বলি, অথবা ‘কালকেই চলে যাবো’–
বলে তুমি পুনর্বার কৃষ্ণকলি চোখে যেই পুরু ফ্রেম
তুলে দিতে, তখনো তোমাকে বড়ো ভালো লাগতো।
আমার দুচোখে স্থির তোমার দুচোখ মনে হতো
যেন মিহি কাসকেটে ঢাকা দুটি কালো চাঁদ,
বড়ো ভালো লাগতো।
ইদানীং তুমি দ্রুত চশমা বদলাচ্ছো;
রঙের ভিন্নতা আনছো ফ্রেমে।
সান্ধ্য কুয়াশার মতো দ্রুত
পুরু সাদা গ্লাস হচ্ছে ক্ষীণতর।
ইদানীং ভিন্ন ভিন্ন চশমায়
তুমি ভিন্নভাবে দেখছো পৃথিবী,
কিন্তু আমি তোমাকে সেরকমই দেখছি।
মিহি কাসকেটে ঢাকা দুটি কালো চাঁদ
আজো সেরকমই হাসে, কাঁদে, কাঁপে...।

তোমার দর্শক

হাতের ভিতরে আরো হাত আছে, আঙুলের ভিতরে
আরো অনেক আঙুল, তুমি কাকে স্পর্শ করবে?
তুমি কাকে ছুঁয়ে দেখতে চাও?
আমার যে হাতে তুমি অপঘাত মৃত্যু দেখে
চমকে উঠেছিলে অথবা আমার যে চোখে তুমি
বিনিদ্র রাত্রির চিহ্ন দেখে তিরস্কার করো,
সে চোখ একাকী নয়, চোখের ভিতরে আরো
চোখ আছে, তুমি কোন্ চোখে চুমু খাবে বলো?

আমি যে হাতে তোমাকে ছুঁই
সে হাতে মাটিকেও কোনোদিন স্পর্শ করি না।
আমি যে চোখে তোমাকে দেখি
সে চোখে কোনোদিন মানুষ দেখিনি।
হৃৎপিণ্ডের নাম নিয়ে যেমন হৃদয় থাকে
লুক্কায়িত বুকের ভিতরে, তেমনি লুকিয়ে আছে
হাতের ভিতরে হাত, চোখের ভিতরে কালো চোখ।
তুমি কার কাছে তুলে দেবে তোমার হৃদয়?
আমি যে হাতে বিপ্লব করি, বাসের হাতলে ঝুলি,
ঘুষ খাই, টাকা গুনি, অন্ন তুলি মুখে,
সে হাতে তোমার স্তন কোনোদিন স্পর্শ করি না।
সে হাতে তোমার আত্মা কোনোদিন স্পর্শ করিনি।
যে চোখ আমাকে দেখে, মানুষ, পৃথিবী দেখে, পাখি–
চাঁদ-ফুল-মৃত্যু-যুদ্ধক্ষেত্র দেখে, সে চোখ আমার নয়,
সে চোখে কখনো আমি তোমাকে দেখি না।

ফেরা

আমি জানি আমার বাড়ির মধ্যে সমস্ত উঠোন জুড়ে
ঘাস উঠেছে এখন, শোঁ শোঁ হাওয়ার রাজ্যে
ফেলে আসা শূন্য ঘরে যাকে আমি বসিয়ে দিয়ে
এসেছিলাম সে আমার ভালোবাসা, ফেরার বিশ্বাস।
এখন বিশ্বাসের চারদিকে আলো আসছে,
ঘাসের মধ্যে পা ফেলেই আবিষ্কার করতে হবে তাকে।
যে দুঃখ ফেলে এসেছিলাম, সে এখন সুখ হয়ে বড় হচ্ছে
কল্পনার বিশ্বাসের ভ্রূণে। নতুন পুকুর থেকে প্রিয় মাছ

বাড়াবে দু'হাত, কবুতর উড়ে এসে মাথার চুলের মধ্যে
গুঁজে দেবে ঠোঁট, চেনা কাক অচেনা নারীর মতো
কৌতূহল ভরা চোখে দেখবে আমাকে।
যে দুঃখ ফেলে গিয়েছিলাম, তার স্মৃতি,
পথ-মাটি-ঘর, জীবনের শৈশব-কৈশোর ছুঁয়ে
অজস্র প্রহর আবার মুখর হবে, আমি জানি,
আমার বাড়ির মধ্যে নিকানো উঠোন জুড়ে
ঘাস উঠেছে এখন। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি,
এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম আবার মুখর হবে।
শুনেছি ফেরার ডাক; যে পথে এসেছিলাম,
সে পথেই ফেরা।
পথের শুকনো বুক নারীর চুলের মতো
টেনে টেনে নিয়ে যাবে হাওয়ায় হাওয়ায়।
রেল লাইন তৈরি হচ্ছে দ্রুত, বিস্ফোরণে
উড়ে-যাওয়া পুল আবার নদীর পাড় বেঁধে দিলে
বেনাপোল-বনগাঁ হয়ে হুশ হুশ ইঞ্জিন ছুটবে দ্রুত।
নদীর জলের মধ্যে, দুরন্ত পদ্মায় আমাদের
উল্টো ছায়া নাম ধরে ডেকে নেবে কাছে।
যে পথে এসেছিলাম, সে পথেই ফেরা।

যেহেতু যাইনি যুদ্ধে

যেহেতু যাইনি যুদ্ধে সশরীরে,
কাঁধে তুলে নিই নি বন্দুক,
তাই ঠিক বলতে পারি না
কখন থামবে যুদ্ধ, মুক্ত হবে ভূমি,

ঝিলের জলের পদ্ম, অঘ্রাণের রোদ,
বৃষ্টি, ফসলের জমি।
যেহেতু যাইনি যুদ্ধে সশরীরে,
সরাসরি সৈনিকের বেশে
অথবা গেরিলা সেজে শত্রুশিবিরের পাশে
ঘুরপাক করি নি কখনো,
তাই ঠিক বলতে পারি না
কবে শেষ হবে যুদ্ধ, মুক্ত হবে ভূমি।
যেহেতু যাইনি যুদ্ধে,
মুখোমুখি হই নি শত্রুর,
তাই ঠিক বলতে পারি না
শত্রু কি বন্ধুর জয়, প্রেম কি ঘৃণার।
সব দৃশ্য শান্ত করে কখন ফিরবো ঘরে,
কখন আবার মাটির বীণার পাশে
অন্ধকারে জ্বলে উঠবে ধূপ।
সর্বত্র কিশোর নদী, জীবনানন্দের
কুয়াশানিশ্চুপ দেশ ডেকে নেবে কাছে,
দেখবো হিজলকণ্ঠ, রাজপথে মেলা,
সৈনিকের শূন্য-তূণে নেমে আসা বেলা।
পিস্তলের নিভৃত কোঠায় শুধু প্রেম,
শুধু ভালোবাসা জমে আছে।

প্রভাবিত সৈনিক

এখন জমতে দাও ঘাসে ঘাসে,
পত্রপুষ্পে শিশিরের কণা।

যে ডাল ফলের ভারে কলির বৈভবে
নত হতে চায়, তাকে নত হতে দাও,
–নাড়াবে না।
ভোরের হাওয়ায় যে সূর্য আকাশে ওঠে
সে উঠুক, মাটির ঠোঁটের মধ্যে
একদিন ফুটে উঠবে সব।
এখন জমতে দাও ঘরে ঘরে,
চাঁদের কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আজ রাত যুদ্ধ নেই,
অস্ত্রের দু'পায়ে প্রণাম করো,
ক্ষান্ত কারো তীক্ষ্ণ কলরব।
যে প্রেম বুকের হাড়ে বেঁধেছিল ঘর,
তাকে নিয়ে কেটে গেছে
আমাদের অনেক বছর প্রতিরোধে,
প্রতিবাদে, উদ্বেল বিক্ষোভে।
এখন জমতে দাও ঘাসে ঘাসে,
পত্রপুষ্পে শিশিরের কণা,
যে ডাল ফুলের ভারে কলির বৈভবে
নত হতে চায়, হোক;
তাকে নত হতে দাও,
–নাড়াবে না।

উল্লেখযোগ্য স্মৃতি

আমার ভালোবাসা কিংবা প্রেম-সংক্রান্ত
কোনো স্মৃতি নেই, যাকে ঠিক ভালোবাসা

কিংবা প্রেম বলা যায়।
একদিন টুকুদি নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে
বলেছিল : ‘তোর বউ তোকে খুব ভালোবাসবে দেখিস।’
সে-ই আমার প্রেম, সেই আমার সর্বপ্রথম কল্পনায়
রমণীর ভালোবাসা পাওয়া, হঠাৎ যৌবন-ছোঁয়া
কিশোরের প্রথম প্রণয়। আর কোনো স্মৃতি নেই।
একদিন নখ কাটতে কাটতে আঙুল কেটে গেলে
প্রেমের শিশির হয়ে রক্ত ঝরেছিল,
ডেটলে রক্তাক্ত ক্ষত ধুয়ে মুছে দিয়ে পূরবী বলেছিল,
‘আমি তার চিরকালের শত্রু।’
আমি আজো শত্রু-মিত্র তফাৎ বুঝি না।
নিজেরই শত্রু হয়ে আমি আজো অপেক্ষমাণ,
ঘুরেফিরে স্মৃতির সমুখে এসে এখনো দাঁড়াই।
আমার এ ছাড়া ভালোবাসা কিংবা প্রেমের কাছাকাছি
আর কোনো স্মৃতি নেই, সে-ই আমার প্রেম,
অদ্যাবধি সেই আমার পুণ্য ভালোবাসা!
আমার একাকী যাত্রা, জীবনের নিঃসঙ্গতা বুঝে
সদ্যবিবাহিতা আমারই সহোদরা
সিঁথিতে রঙিন চাঁদ মেখে নিয়ে একদিন
শিয়রের কাছে বসেছিল : ‘চল ক’দিন আমার বাড়ি,
সমুদ্রের হাওয়ায় কাটাবি।’
আমি জানি আজো সেই সমুদ্রের হাওয়া,
আজো সেই একমাত্র ভালোবাসা স্মৃতি,
আজো সেই মুহূর্তের প্রেম।
আমার ভালোবাসা কিংবা প্রেম-সংক্রান্ত
আর কোনো স্মৃতি নেই।

স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর

জননীর নাভিমূল ছিঁড়ে উলঙ্গ শিশুর মতো
বেরিয়ে এসেছো পথে, স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি পাক আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে,
প্রাত্যহিক বাহুর পেশীতে, জীবনের রাজপথে,
মিছিলে মিছিলে; তুমি বেঁচে থাকো, তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তোমার হা-করা মুখে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্ত অবধি হরতাল ছিল একদিন,
ছিল ধর্মঘট, ছিল কারখানার ধুলো।
তুমি বেঁচেছিলে মানুষের কলকোলাহলে,
জননীর নাভিমূলে ক্ষতচিহ্ন রেখে
যে তুমি উলঙ্গ শিশু রাজপথে বেরিয়ে এসেছো,
সে-ই তুমি আর কতদিন ‘স্বাধীনতা, স্বাধীনতা’ বলে
ঘুরবে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে সম্রাটের মতো?
জননীর নাভিমূল থেকে ক্ষতচিহ্ন মুছে দিয়ে
উদ্ধত হাতের মুঠোয় নেচে ওঠা, বেঁচে থাকা
হে আমার দুঃখ, স্বাধীনতা, তুমিও পোশাক পরো;
ক্ষান্ত করো উলঙ্গ ভ্রমণ, নয়তো আমারো শরীর থেকে
ছিঁড়ে ফেলো স্বাধীনতা নামের পতাকা।
বলো উলঙ্গতা স্বাধীনতা নয়,
বলো দুঃখ কোনো স্বাধীনতা নয়,
বলো ক্ষুধা কোনো স্বাধীনতা নয়,
বলো ঘৃণা কোনো স্বাধীনতা নয়।
জননীর নাভিমূল ছিন্ন-করা রক্তজ কিশোর তুমি

স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি বেঁচে থাকো
আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে, প্রেমে, বল পেন্সিলের
যথেচ্ছ অক্ষরে,
শব্দে,
যৌবনে,
কবিতায়।

পাটের শাড়ির লাল পাড়

কী সুন্দর এতদিন লুকিয়ে রেখেছো
বুকের মাংসের নিচে কালো ধান,
পাটের শাড়ির লাল পাড়ে
সোনালি বিদেশী মুদ্রা, ভালোবাসা, টাকা।
কী সুন্দর এতদিন লুকিয়ে রেখেছো
শাক-শব্জি, টমেটো, গোলাপ ফুল,
আম-জাম, হিজলের ছায়া।
এতদিন কী সুন্দর রাখতে লুকিয়ে
শৈশবের ধুলো থেকে বার্ধক্যের কোমল কবর।
তোমার ঋণের বোঝা ঘরে ঘরে, রক্তে রক্তে,
বুকে বুকে দোলা দিয়ে যেত।
স্বদেশের সবুজ সঞ্চিত শোভা
কী সুন্দর এতদিন রেখেছো লুকিয়ে।
এবার হয়েছে ঋণী মানুষের কাছে,
যার রক্তে ঋণ ছিল, তার বুকে নিয়েছো আশ্রয়।
আজ তাই মাটির নরোম মাংসে
ফলে না ফসল, কালো ধান।

রূপালি ফলার ঘায়ে বাংলাদেশ ভরে ওঠে হাড়ে,
অজস্র কংকাল, খুলি, চুড়িভরা হাত
এখন তোমাকে ঢাকে পাটের শাড়ির লাল পাড়ে।

ভয়

তোমারো ছিল ভয়, রাজাকার, পাক-সেনা,
কিংবা ভ্রষ্ট-চরিত্র মানুষের।
বিড়ালের নতুন ছানার মতো সোনালি যৌবন
তুমি মুহূর্তেই ফেলতে লুকিয়ে,
যদি ওরা আসে, এই ভয়ে ডেকে নিতে কাছে।
সন্ত্রস্ত তোমার মুখ হঠাৎ আমার দিকে
ফিরে গিয়েছিল, ভয়ে।
তোমার দু'হাতে, চুলে, নখে,
কচু-রঙ শাড়ির আঁচলে সর্বত্র ভয়ের চিহ্ন,
ভীত শিহরন, যদি ওরা আসে।
মানুষের প্রিয়তম বয়সের কাছে এসে
তোমার বয়স যেন থেমে গিয়েছিল ভয়ে,
তখন আমিই শুধু তোমার সাহস হয়ে
তোমার চতুর্দিকে কিছুদিন....
আহা, স্বাধীনতা, যুদ্ধ, ভ্রষ্টমৃত্যুভয়,
কী সুন্দর থোকা থোকা প্রিয় অভিজ্ঞান।
যতদিন যুদ্ধ ছিল, ততদিন তুমি ছিলে
আমার প্রেমিকা।
আজ তুমি মুক্ত, রুদ্র, অসীম সাহসী।
হাজার হাজার মাইল।

অনায়াসে উড়ে যেতে পারো, ভয় নেই।

শুধু ভয়, যুদ্ধ নয়, ওরা নয়,

আমি যদি আসি।

সমাপ্ত